সেবক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক পত্রিকা ৮ পাতা

কলকাতা ২৭ কার্তিক ১৪২১ ● শুক্রবার ১৪ নভেম্বর ২০১৪ ● ২ টাকা

sebakpatrika@gmail.com

আলোর বিপ্লবে নোবেল পুরস্কার

হিরণ্ময় সাহা

২০১৪ – পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করলেন রয়াল সুইডিস আকাডেমির বিজ্ঞান বিভাগ –"নীল রঙের দক্ষ লেড (LED-Light Emitting Diode) – আবিষ্কারের জন্য যা কিনা উজ্জ্বল ও শক্তিসংরক্ষক সাদা আলো তৈরী করা সম্ভব করেছে।" পুরস্কার প্রাপক হলেন তিনজন জাপানী বিজ্ঞানী **ইসামু আকাসাকী, হিরোশি আমানো** এবং **সুজি নাকামুরা**। পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার বিজ্ঞানীদের সর্বোচ্চ সম্মান। আলফ্রেড নোবেলের ইচ্ছা অনুসারে মানবজাতির কল্যাণকর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। যদিও বেশীরভাগ সময়ই পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় এমন সব বিষয়ের জন্য যার সঙ্গে মানবকল্যাণের সরাসরি সম্পর্ক সহজে বোঝা যায় না। পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের জগতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যই এই পুরস্কার সাধারণত দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এ বছরের এই নোবেল পুরস্কার ২০০০ এবং ২০০৯ সালের নোবেল পুরস্কারের মতই সরাসরি মানব সমাজের কল্যাণমূলক প্রযুক্তির জন্য দেওয়া হয়েছে। ২০০০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন জ্যাক কিলবি–বস্তুতঃ একজন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ার—যিনিইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আবিষ্কার করেছিলেন। বর্তমানযুগের ইলেকট্রনিকস্ ও কম্যুনিকেশনের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটে গেছে তার মূলে রয়েছে এই 'ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট'। ঐ ২০০০সালেই রাশিয়ান বিজ্ঞানী জোরেস আলফেরভ এবং জার্মান বিজ্ঞানী হার্বার্ট ক্র্যামার অর্ধপরিবাহী লেসার আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। এরপর ২০০৭সালে পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় চার্লস কাও নামে একজন চিনা বিজ্ঞানীকে অপটিকাল ফাইবার কেবল্ (OFC) আবিষ্কারের জন্য। অপটিকাল ফাইবার কেবল্ যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী বিপ্লব এনে দিয়েছে। ঐ একই বছরে (২০০৯) পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কারের অর্ধেক পান যুগ্মভাবে আমেরিকার বেলল্যাবের উইলার্ড রয়েল এবং জর্জ স্মিথ–তাঁদের যুগান্তকারী আবিষ্কার সিসিডি (CCD) ক্যামেরা ও প্রযুক্তির জন্য।

এ বছরের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কারের কেন এত গুরুত্ব? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে জানতে হবে বর্তমান যুগের তীব্র শক্তি সংকটের কথা। পরিবেশ দূষণের কথা, সবুজ শক্তির কথা। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন ধারণের মানের ক্রমাগত উন্নতি হয়েছে। ফলে মাথাপিছু শক্তি ব্যবহারের পরিমাণও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। উন্নত দেশগুলোতে গড়ে বার্ষিক মাথা পিছু শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ৪০০০ - ৫০০০ একক (KWh) যেখানে ভারতের বা সমতুল্য দেশগুলোতে ঐ পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ৫০০ - ১০০০(KWh)এর মধ্যে। আর্থিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু শক্তির চাহিদা তাই বেড়ে চলেছে। কিন্তু এত শক্তির যোগান কোথায়? কয়লা, তেল বা গ্যাসের পরিমাণ তো ক্রমশঃই কমে আসছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান আর ২০-৩০ বছরের মধ্যে তেলের যোগান নিঃশেষ হয়ে যাবে। ৫০-৮০ বছরের মধ্যে কয়লা শেষ হয়ে যাবে। গ্যাসের অবস্থা আরও করুণ। তাছাড়া যত দিন যাচ্ছে কয়লা বা তেল বা গ্যাস থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ ক্রমশঃই দুর্মূল্য হয়ে উঠছে। এরপর আছে পরিবেশ দূষণের নিদারুণ দুশ্চিন্তা। কয়লা-তেল-গ্যাসজাত তাপবিদ্যুতে উৎপন্ন কার্বণ-ডাই-অক্সাইড পৃথিবীর বায়ু পরিমণ্ডলে তাপপ্রতিফলক স্তর তৈরী করে যার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পৃথিবীর উষ্ণায়ন হয় (Global warming) যা পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

বর্তমানকালের এই তীব্র শক্তিসংকটের হাত থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে :

১) জীবনযাত্রার মান অক্ষুন্ন রেখে – **শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ কমানো**।

২) সৌর, বায়ু বা জৈব ইত্যাদি বিভিন্ন দূষণ মুক্ত **নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবহার**।

২০১৪ সালের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার শক্তি সংকট সমাধানের প্রথম উপায়ের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। আরেকটু বিশদ ব্যাখ্যা করা যায়।

হিসেব করে দেখা গেছে যে আমাদের বর্তমান শক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন দিকগুলোর মধ্যে প্রায় ২০-৩০% খরচ হয় আলো জ্বালাবার জন্য।

ইলেকট্রিক বাল্ব যা টমাস আলভা এডিসন আবিষ্কার করেছিলেন এবং যা ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোকবর্তিকা ছিল—তার আলো উৎপাদনের দক্ষতা হচ্ছে মাত্র প্রতি ওয়াটে ১৬লুমেন অর্থাৎ বিদ্যুৎ থেকে আলোক শক্তি রূপান্তরের দক্ষতা মাত্র ৪%। গত বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত ও বহুল ব্যবহৃত ফ্লুরেসেন্ট বাতির (তথাকথিত টিউব লাইট)

এরপর ৪ পাতায়

AGNI

AGNI POWER & ELECTRONICS PVT. LTD.

An ISO 9001 :2008 and OHSAS: 18001 : 2007 Certified Company

Leader in Solar PV Engineering

MNRE, Govt. Of India
Accreditated Channel Partner

HEAD OFFICE:

114, Rajdanga Gold Park (1st floor), Kolkata-700 107
Tele Fax: (091) (33) 4005-1193/4061-0038
E-mail: Info@agnipower.com/Web: www.agnipower.com

গান্ধী সেবা সংঘের ইতিবৃত্ত

(স্থাপিত - ১৯৪৬)

উৎপল ঘোষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'মাণিক্য-মঞ্চ' নির্মিত হওয়ায় সংঘের নিয়মিত-বার্ষিক সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও এতদঞ্চলের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এই মঞ্চে নিয়মিত সভা ও অনুষ্ঠান শুরু করেন। উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠানগুলি, 'ভারতীয় সংগীত সমাজ', 'পূর্ব কলিকাতা নাগরিক পরিষদ', 'সপ্তর্ষি', 'আত্মবিকাশ' এবং 'ইকো' প্রভৃতি।

তখনও সংঘের সাধারণ গ্রন্থাগারটির অবস্থান ছিল একতলার শেষের ঘরটিতে। কিন্তু মাণিক্য মঞ্চে অনুষ্ঠান চলাকালীন গ্রন্থাগারের পঠন-পাঠন বিঘ্নিত হত। তাছাড়া গ্রন্থাগারের সম্প্রসারনেরও প্রয়োজন দেখা দিল। তাই ২০০৪ সালে গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত হ'ল দোতলার শেষ ঘরটিতে। তখন গ্রন্থাগারের কর্মী ছিলেন শিপ্রা সেন ও মনতোষ ভট্টাচার্য্য। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীমতী মায়া রায়, শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রী দিলীপ সেনগুপ্ত ও বাসুদেব ঘোষ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ৮০ ও ৯০ এর দশকে যে সকল কর্মীদের একান্ত নিষ্ঠা ও নিরলস প্রচেষ্টায় সঙ্ঘের বিভিন্ন পরিষেবা পরিচালিত হ'ত তাঁদের মধ্যে গ্রন্থাগার বিভাগে শ্রী কনকাদ্রি সরকার ও সৌমেন্দু মণ্ডল, চিকিৎসা বিভাগে রাম নাগ (প্রয়াত), প্রসন্ন রায়(প্রয়াত), শিশু বিভাগে অলক ঘোষ(প্রয়াত) প্রথা বহির্ভূত প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে বাণী চৌধুরী(প্রয়াত), রাণী মাইতি(প্রয়াত) প্রমুখের দীর্ঘদিনের আন্তরিক সেবাকার্য্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঐ দুই দশকে দাতব্য চিকিৎসা (এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি) বিভাগে যে সকল চিকিৎসকেরা নিয়মিত সযত্নে রোগীদের চিকিৎসা ক'রতেন, তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় ডাঃ বি. দাস, ডাঃ এম. এস চক্রবর্ত্তী, ডাঃ এস. সি দত্ত, ডাঃ এস. পি, মুখার্জী, ডাঃ এস. নন্দী, ডাঃ ঝর্ণা পাল চৌধুরী, ডাঃ এ. কে দাস, ডাঃ এ. সাহা ও পরবর্ত্তীকালে ডাঃ জয়ন্তী পোদ্দারের অবদান উল্লেখযোগ্য)।

সাধারণ গ্রন্থাগার

সাধারণ গ্রন্থাগারটির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন হয় ২০০৬-০৭ সালে। কার্য্যকরী সমিতির সদস্যা শ্রীমতী তপতী গাঙ্গুলী ও শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অবিরাম প্রচেষ্টায় 'রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউনডেশন'-এর আর্থিক অনুদানে পাঠাগারের পুস্তক ক্রয়, আলমারী ও বইয়ের তাক, চেয়ার-টেবিল প্রভৃতি কেনা হয়। বর্ত্তমানে শিশুদের জন্য পৃথক শিশু-বিভাগ, মহিলা ও প্রবীণ নাগরিকদের উপযোগী পুস্তক ও পত্র / পত্রিকার যথেষ্ট সরবরাহ আছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৯০০০ এবং সদস্য সংখ্যা প্রায় ২০০ জন। দঃ দম্‌দম্‌ পৌরসভা ও উঃ ২৪-পরগণা জেলা লাইব্রেরীর বার্ষিক অনুদানে ও সদস্যদের চাঁদায় বর্তমানে গ্রন্থাগারের নিয়মিত বই-কেনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যায়ভার বহন করা হয়। গ্রন্থাগার পরিচালনায় আছেন, শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী তপতী গাঙ্গুলী শ্রী পি. পি. চক্রবর্ত্তী, ডাঃ সি. কে দত্ত প্রমুখ।

সেবা নিবাস

ইতিমধ্যে ২০০৫ সালে সাধারণ সম্পাদক শ্রী গৌতম সাহার উদ্যোগে এবং স্থানীয় ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ অসীম চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ক্যানসার রোগের সচেতনতা শিবির এবং ক্যানসার রোগীদের যথাযথ চিকিৎসার পরামর্শের জন্য একটি

ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসা করাতে কলকাতায় এসে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার জন্য সুলভ বাসস্থানের ব্যবস্থা

'কাউনসেলিং ও গাইডেন্স সেন্টার' খোলা হয় দোতলায় প্রথম ঘরটিতে। "সুবোধ মিত্র ক্যানসার হাসপাতালের সহযোগিতায় এবং সেবা সংঘের উদ্যোগে বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুবীর সান্যাল, ডাঃ জয়দীপ মুখার্জী, ডাঃ গৌতম মুখার্জী প্রমুখেরা সংঘ-ভবনে একাধিক সেমিনার ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। আহ্বায়ক ছিলেন ডাঃ অসীম চট্টোপাধ্যায়। ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসা করাতে কলকাতায় এসে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার জন্য সুলভ বাসস্থানের অভাবে বহু রোগী চিকিৎসা সম্পন্ন করাতে পারেন না। তাই সভাপতি মনি চক্রবর্ত্তী, গৌতম সাহা, ডাঃ হিরন্ময় সাহা ও ডাঃ অসীম চ্যাটার্জীর বিশেষ উদযোগ এবং সহৃদয় ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্যে গড়ে উঠল 'সেবা-নিবাস'— ক্যানসার রোগীদের স্বল্প-ব্যয়ের চিকিৎসাকালীন বাসস্থান। সম্পূর্ণ দানের অর্থে মাত্র ৭-৮ মাসের মধ্যে দোতলায় একটি হলঘর ও দুই শয্যা বিশিষ্ট (সংলগ্ন শৌচাগার সহ) চারটি ঘর গড়ে তোলা হ'ল। 'সেবা নিবাসের' নির্মাণ কাজে কারিগরী পরামর্শ দিয়েছিলেন ইন্‌জিনিয়ার শ্রী শংকর দাস ও শ্রী সুবীর কুণ্ডু মহাশয়। 'সেবা-নিবাসের নির্মাণকাজে যে সকল মহানুভব ব্যক্তিরা আর্থিক সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাক্তন সভাপতি মণি চক্রবর্ত্তী, জোড়াসাঁকোর দাঁ-পরিবার, বর্তমান সভাপতি রঘুনাথ কুণ্ডু, বালী-উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাঠক, পৃথা-দাসগুপ্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটি, শ্রী অশোক সাহা প্রমুখ ব্যাক্তিরা। অবশেষে ২০০৫ সালের অগাষ্ট মাসে 'সেবা-নিবাস'-এর উদ্‌বোধন করেন তৎকালীন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী শ্রীমতী রমলা চক্রবর্ত্তী। উপস্থিত ছিলেন আহ্বায়ক ডাঃ অসীম চট্টোপাধ্যায় , বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসাকালীন সুলভ বাসস্থান, 'সেবা-নিবাসে'র প্রচার করা হয় এবং যোগাযোগ করা হয় আর. জি. কর হাসপাতাল, সুবোধ মিত্র ক্যানসার হাসপাতাল, নীলরতন সরকার হাসপাতাল ও চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে। ২০০৬-০৭ সাল থেকে 'সেবা-নিবাসে' রোগী ও তাঁর পরিবার পরিজনেরা আশ্রয় নিতে শুরু করেন। রোগীদের বস-বাসের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জল, রান্না ও খাওয়ার ব্যবস্থা, ফ্রিজ ও বিনোদনের জন্য টি. ভির ব্যবস্থাও রাখা হয়। দিনে ও রাতে রোগীদের ভর্ত্তি ও দেখাশুনার জন্য দুজন পরিদর্শক (সুপারভাইজার) আছেন। বর্ত্তমানে শ্রীমতী দীপা দত্ত ও অপূর্ব কুণ্ডু। রোগীদের আশ্রয়ের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় দোতলার উত্তরের বড় ঘরটিতে ছয়-শয্যা বিশিষ্ট একটি ডর্‌মেটরীর ব্যবস্থাও করা হয়। 'সেবা নিবাসের সম্প্রসারণের জন্য, তিনতলার সিঁড়ি নির্মানের জন্য আবেদনক্রমে প্রয়াত সাংসদ অমিতাভ নন্দীর সাংসদ তহবিল থেকে অনুদান পাওয়া যায় এবং সিঁড়ি নির্মাণ সম্পন্ন হয় ২০০৯ সালে। এরপর তিনতলায় দুই শয্যা বিশিষ্ট ছয়টি কেবিন ও সংলগ্ন দুটি শৌচাগার এবং রান্না ও খাওয়ার একটি সাধারণ ক্যান্টিন নির্মাণ করা হয়। এই নির্মাণকাজে যাঁদের আর্থিক সাহায্য উল্লেখযোগ্যঃ শ্রী দেবেন্দ্র ও রমা পাঠক, শ্রী সোমনাথ ভট্টাচার্য্য, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাতিয়ালা, শ্রী অচীন বিষয়ী, শ্রী এন রামচন্দ্রন ও কার্য্যকরী সমিতির সদস্যেরা। অবশেষে ২০১২ সালের ২রা অক্টোবর সেবা-নিবাসের নবনির্মিত ঘরগুলির উদবোধন করেন মাননীয় স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদার ও স্থানীয় বিধায়ক শ্রী সুজিত বোসের উপস্থিতে। 'সেবা-নিবাসের' দৈনন্দিন পরিচালনার দায়িত্বে আছেন শ্রী সমীর নন্দী, শ্রী অনিরুদ্ধ ঘোষ ও শ্রী সুব্রত পাল।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ঃ

বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য একটি ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রয়াত তপন সিক্‌দার মহাশয়ের সাংসদ তহবিলের অর্থ সাহায্যে দোতলার উত্তর প্রান্তে একটি বড় ঘর নির্মিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে ঐ বছরেই পঃ বঃ সরকার অধীনস্থ "কম্যুনিটি পলিটেক্‌নিক সেল' এর B. I. T পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২০জন শিক্ষার্থী পোষাক নির্মাণ ও সেলাই-এর প্রশিক্ষণ পেয়ে অনেকে স্বনির্ভর হয়েছেন। সরকারী প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও সংঘের পরিচালনায় সেলাই, বোনা ও পোষাক নির্মাণের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ১৫-২০জন শিক্ষার্থীকে। এই শিক্ষা-কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেন শ্রীমতী বীণা মাকাল।

স্বাস্থ্য-বিভাগ ঃ

দীর্ঘ তিন দশক যাবৎ সংঘের দাতব্য চিকিৎসা এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি পরিষেবা চালু আছে। এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার মাত্র ১০টাকা ও হোমিওপ্যাথি বিভাগে মাত্র ৫টাকা টিকিটের বিনিময়ে রোগীদের চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়। এ্যালোপ্যাথি বিভাগে গড়ে মাসিক ৩৫০-৪০০জন এবং হোমিওপ্যাথি বিভাগে মাসিক গড়ে ৪০০-৫০০ জন রোগী এই চিকিৎসা পরিষেবা পান। এ্যালোপ্যাথি বিভাগে দুজন চিকিৎসক ডাঃ ঝর্ণা পালচৌধুরী ও ডাঃ জয়ন্তী পোদ্দার নিয়মিত চিকিৎসা করে থাকেন। সহকারী অভিজ্ঞ কম্‌পাউন্ডার আছেন শ্রী অনিল চক্রবর্ত্তী এবং কর্মী শ্রী সুরেশ ধর। হোমিওপ্যাথি বিভাগে ডাক্তারবাবু ডাঃ এস. এম. চক্রবর্ত্তী ও সহকারী কর্মী শ্রীমতী অঞ্জলি সরকার। এছাড়া সপ্তাহে দুদিন চক্ষু পরীক্ষা ও একদিন স্বল্পমূল্যে E. C. G পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। পূর্ব কলিকাতা নাগরিক পরিষদের রাম অবতার যোশীর উদ্যোগে ও সহযোগিতায় বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা, ওষুধ, চশমা বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য-শিবিরে রক্ত-পরীক্ষা, ডায়বেটিস রোগের পরীক্ষা ও চিকিৎসা পরামর্শ, থাইরয়েড ও আর্থারাইটিস অসুখেরও চিকিৎসার সুপরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বে আছেন শ্রীমতী জয় গুহঠাকুরতা, ডাঃ টি. কে. চট্টরাজ, উৎপল ঘোষ শ্রী পৃথ্বিপতি চক্রবর্ত্তী ও ডাঃ সি. কে. দত্ত। (ক্রমশ)

আজ শিশুদিবস

সেবক প্রতিবেদন ঃ ভারতবর্ষে ১৪ই নভেম্বর দিনটির একটি বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন। 'চাচা' নেহেরুর শিশুদের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনস্বীকার্য। তাই ভারতে শিশুদিবস হিসেবে পালিত হয় জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিনটির স্মরণে। ১৪ নভেম্বর। বড় বড় নেতা বা মহাত্মারা সব সময়ই অনুভব করেছেন যে দেশের শিশুরা যেন অনুকূল পরিবেশে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। আমরা সাধারণ মানুষ হয়েও সেটা সবসময় অনুভব করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা কি সম্পূর্ণভাবে আজও সম্ভব হচ্ছে? কাগজে, খবরে নানাভাবে শিশু নিপীড়ন, অত্যাচার, দুঃখকষ্টের কথা শুনতে পাই। তাতে মন ভারাক্রান্ত হয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি'র বিখ্যাত উক্তির স্মরণে বলতে হয়ঃ 'শিশুরাই হল ভবিষ্যৎ পৃথিবীর প্রকৃত সম্পদ।' Innocence, Simplicity,Faith, Outlook এবং Light। এই মৌলিক পাঁচটি গুণই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সারা পৃথিবীর শিশুর মধ্যেই অঙ্কুরিত থাকে। তাই চাই প্রতিটি শিশুর শিক্ষার-বিকাশ, শারীরিক, মানসিক-সুস্থতা, পরিবার-পরিজনের ভালোবাসা এবং সর্বোপরি 'খাদ্য'।

১৯২৫ সালে জেনেভা কনফারেন্সে সুইৎজারল্যান্ড এবং Women's International Democratic Federation প্রস্তাব করে আন্তর্জাতিক শিশুদিবস হোক ১জুন। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ অনুমোদন করে আন্তর্জাতিক শিশুদিবস হিসেবে ২০ নভেম্বরকে। যা আজও চলছে। যদিও নানান দেশের রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে ভিন্ন ভিন্ন দিনকে মানা হয় শিশুদিবস হিসেবে। যেমন, চীনে মানা হয় ১জুন, বাংলাদেশে মুজিবর রহমানের জন্মদিনকে, অর্থাৎ ১৭ই মার্চ। পাকিস্তানে ১জুলাই। আমেরিকাতে ১জুন। ১৯৯০ সালের আগে পূর্ব জার্মানিতে শিশুদিবস মানা হত ১জুন এবং পশ্চিম জার্মানিতে ২০সেপ্টেম্বর। পরবর্তী দুই জার্মানি মিলে যাওয়ার পর ১জুন-কেই শিশুদিবস হিসেবে মেনে নেওয়া হয়।

International Labour Organisation -এর তথ্য জানাচ্ছে আজও পৃথিবীতে শিশু-শ্রমিকের সংখ্যা ১৫৩ মিলিয়ন, যাদের বয়স ৫ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। শিশু-শ্রম, শৈশব অঙ্কুরেই বিনষ্টের প্রতিবাদে ১৯৯৯ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নেওয়া শিশু-শ্রম বন্ধের বিরুদ্ধে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরও এই ঘৃণ্য প্রক্রিয়া আজও বিলোপ হয়ে যায়নি। দেশ-দেশান্তরে আজও সহজলভ্য শিশুশ্রমিক। গ্রাম-গ্রামান্তরের ঘরে ঘরে আজও শিশু-নিষ্পেষণ অব্যাহত। ২০১৪ নোবেল কমিটির বিচারে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপকদেরও ক্ষেত্রটি ছিল শিশুমুক্তির লড়াই। শিশু-কৈশোরের অধিকার, শিশু-শিক্ষার অধিকারের লড়াই।

'গান্ধী সেবা সংঘ'—তার নিজের ক্ষুদ্র পরিসরে সব সময় শিশুদের কথা আন্তরিকভাবে ভাবনা চিন্তা করেছে। ছোটোদের জন্যে গান, নাচ, আবৃত্তির ক্লাস শুরু করেছে যা আজও অব্যাহত। একটু অতীতের কথা ভাবলে দেখতে পাই—১৯৮৮ সালের ১৫ই অগাষ্ট Lions Club, Lake Garden's এর সহযোগীতায় গান্ধী সেবা সঙ্ঘে পূর্ব ভারতের প্রথম 'Toy Library' স্থাপিত হয়। সে সময়ে এই অঞ্চলে এই লাইব্রেরি অত্যন্ত সাড়া ফেলে। প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত প্রথমে লাইব্রেরি খোলা থাকত।

শিশুরা বসে খেলতে পারে—বাড়ীতেও কিছু কিছু খেলনা নিতে পারত। চার বছর সক্রিয়ভাবে চলার পরে অনুদানের অভাবে বন্ধ করতে হয়। গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে কোচিং ক্লাস আরম্ভ করা হয়েছিল মেধাবী নিম্নবিত্ত শিশুদের জন্য। এই সঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে জ্ঞানীগুণী শিক্ষক শিক্ষিকা আগ্রহী হ'য়ে এগিয়ে এসেছিলেন ক্লাস নেবার জন্য। যদি কোনো শিশু এখনও আগ্রহী থাকে তবে অবশ্যই সঙ্ঘের কোচিং-এর ব্যবস্থা করতে পারা যাবে। গান্ধীর শিশুবিকাশ কেন্দ্র আছে। যেখানে প্রতি রবিবার আঁকার ক্লাস হয়। সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত।

বিভিন্ন রকম নাচের ক্লাস —কারাটে ক্লাস, রোলার স্কেটিং, গিটার, কিবোর্ডের ক্লাস চলছে নিয়মিত ভাবে। প্রয়োজনে ইচ্ছুক মানুষেরা গান্ধী সেবা সঙ্ঘে এসে যোগাযোগ করতে পারেন।

পরিশেষে আবারও বলি আজ সেই শিশুদিবস। আসুন এই ১৪ নভেম্বরে আমরা শপথ নিই, গড়ে তুলতে ডাক দিই এমনই এক নতুন পৃথিবী, যেখানে কোনও শিশুই হারাবে না তার শৈশব, তার কৈশোর। কারণ আজকের শিশুরাই আগামী পৃথিবীর প্রকৃত সম্পদ।

যৌথ উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সেবক প্রতিবেদন : সেবক পত্রিকা প্রকাশের দিনই, গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০১৪ রবিবার সন্ধ্যায় সংঘ-ভবনে এক অভিনব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সুবোধ ঘোষ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কমিটি, ইন্টারন্যাশানাল সোসাইটি ফর ইন্টার কালচারাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ এবং গান্ধী সেবা সংঘের যৌথ প্রযোজনায় একযোগে তিনটি উপলক্ষ্যের "স্মরণ-সংবর্ধনা-উদ্বোধন"-এর অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়। (১) বরেণ্য সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের ১০৬ তম জন্মশতবার্ষিকী পালন, (২) প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী চারু খানের ৮০ বছর পূর্তিতে সংবর্ধনা জ্ঞাপন, (৩) গান্ধী সেবা সংঘের মুখপত্র 'সেবক'-এর প্রথম প্রকাশ। অনুষ্ঠান শুরু হয় ডাঃ সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের 'বেদমন্ত্র ও উপনিষদের বাণী পাঠ' দিয়ে। শিল্পী চারু খানের "শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু বর্ষীয়ান সাহিত্যিক ও কবি তরুণ সান্যাল। শিল্পী চারু খানকে পুষ্প স্তবক, সাম্মাণিক অর্থ ও উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে তিনটি সংগঠনের সভাপতি — শ্রীহীর ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ হিরন্ময় সাহা। প্রধান অতিথি মাননীয় বিধায়ক শ্রী সুজিত বসু শিল্পীকে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে পঁচিশ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন।

গান্ধী সেবা সংঘের পত্রিকা "সেবক"-এর প্রথম সংখ্যার প্রকাশের উদ্বোধন করেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী সুজিত বসু। সেই প্রসঙ্গে সেবা সংঘের দীর্ঘদিনের বহুমুখী জনকল্যাণকর পরিষেবার বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি আশ্বাস দেন, নির্মীয়মাণ হাসপাতাল "গান্ধী সেবা সদন" অচিরেই জনসাধারণের সেবার জন্য উদ্বোধন করা হবে। ঐ হাসপাতালে বহুমুখী পরিষেবা এবং অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা হবে।

সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের কথাসাহিত্য ছোটগল্প তাঁর সাহিত্যে জীবনদর্শন ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্ণধার শ্রী উৎপল ঝা, সাহিত্যিক তরুণ সান্যাল, শ্রী সত্যম ঘোষ, শ্রীহীর ভট্টাচার্য্য এবং অধ্যাপক শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়। পরিশেষে অনুষ্ঠিত হয় "কবিতা পাঠের আসর", পরিচালনায় ছিলেন ডাঃ সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। বহু দর্শক ও শ্রোতার সমাগমে সমগ্র অনুষ্ঠানটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

সেবক
কলকাতা ২৭ কার্তিক ১৪২১ ● শুক্রবার ১৪ নভেম্বর ২০১৪

সেবকের সেবা

প্রথম সংখ্যায় দাবি করেছিলাম পত্রিকা 'সেবক' তার নামের প্রকৃত অর্থই বহন করবে। 'গান্ধী সেবা সঙ্ঘ' তার নিয়মিত পরিষেবাগুলো জনসমক্ষে লিখিতভাবে প্রথম সংখ্যায় যথাসম্ভব তুলে ধরেছে। সর্বোপরি সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে প্রায় নির্মিত হাসপাতালের আপাত অবস্থান সম্পর্কেও বাস্তবোচিত রূপরেখা দিতে পেরেছে। পত্রিকা প্রকাশের দিনে উপস্থিত বিধায়ক সহ অঞ্চলের বিশিষ্টরা নানান পরামর্শের সঙ্গেই 'সেবক'-এর প্রথম সংখ্যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছেন। অঞ্চলে এমন একটি রঙিন, ঝক্‌ঝকে প্রকাশনা যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে, ঠিক তেমনি, দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন হিসেবে জানাই, যদি কিছু 'কম' থেকে থাকে, পত্রিকায়, সেক্ষেত্রে সাদরে আমন্ত্রণ, 'সেবক'-এর সেবায় এবার আপনিও সামিল হোন। আলোচনা চলুক, গঠনমূলক বাক্-বিতণ্ডা শুরু হোক 'সেবক'-কে নিয়ে। যাঁরা পড়ছেন, যাঁরা লিখছেন, যাঁরা অপরকে পড়াচ্ছেন তাঁদের থেকে আসুক বিপুল সাড়া। আলোকিত হোক কলরবে।

আলোর বিপ্লবে নোবেল পুরস্কার

১ পাতার পর

আলোকদক্ষতা হচ্ছে প্রতি ওয়াটে ৭০ লুমেন। তুলনামূলকভাবে সাদা লেড লাইটের আলোকদক্ষতা হচ্ছে প্রতি ওয়াটে ৩০০ লুমেন। তাছাড়া একটা ফ্লুরেসেন্ট লাইট ঠিক করে আলো দিতে পারে ১০,০০০ ঘন্টা সেখানে লেড ১,০০,০০০ ঘন্টার ওপর আলো দিতে পারে। সহজেই বোঝা যায় যে অবিষ্কারের ১৫-২০ বছরের মধ্যেই কেন পৃথিবী জুড়ে লেড আলোকের ঝর্ণাধারায় বিপ্লবের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। এক কথায় বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীকে যদি বলা যায় বাল্ব লাইটের শতাব্দী, বিংশ শতাব্দীকে ফ্লুরেসেন্ট লাইটের শতাব্দী, তবে একবিংশ শতাব্দী নিঃসন্দেহে লেড লাইটের শতাব্দী হবে।

লেড লাইটের আলোকদক্ষতা এত বেশী কেন? ইলেকট্রিক বাল্বে, তড়িৎ বিদ্যুৎবাহী বাতির তারকে গরম করে এবং এই উত্তপ্ত তার থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়—এই পদ্ধতি মোটেই দক্ষ নয়। ফ্লুরেসেন্ট বাতিতে বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে গ্যাস আয়নিত হয় এবং এই আয়নিত গ্যাস থেকে আলোর বিচ্ছুরণ হয়। এর দক্ষতা তাপ থেকে উৎপন্ন আলোর চাইতে অনেক বেশী, কিন্তু তাও প্রত্যক্ষ শক্তির রূপান্তর নয়। কিন্তু লেড লাইট তৈরী হয় সরাসরি বিদ্যুৎ থেকে অর্ধপরিবাহীর আলোক বিচ্ছুরণে—মাঝখানে তাপ বা অন্য কোন শক্তির রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই লেড লাইট এত দক্ষ হতে পারে। সৌরকোষে যেমন সরাসরি আলোক থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ঠিক তাতে পরিপূরকভাবে লেডকোষে সরাসরি বিদ্যুৎ চালনা করলে আলো পাওয়া যায়।

গ্যালিয়াম নাইট্রাইড (GaN) অর্ধ পরিবাহীর বিভিন্ন স্তর দিয়ে তৈরী হয় লেড - ইংরাজীতে LED(Light Emitting Diode)। GaN অর্ধপরিবাহীর বিভিন্ন স্তর পরীক্ষাগারে তৈরী করা এবং তাদের ধর্মকে ক্রমাগত উন্নত করে নীল আলোর বিচ্ছুরণ সৃষ্টি করার অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের জন্যই নোবেল পুরস্কার পেলেন জাপানী বিজ্ঞানীত্রয়ী। প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর আগেই গ্যালিয়াম ফসফাইড (GaP) অর্ধপরিবাহী লাল ও সবুজ আলো বিচ্ছুরণের উপায় আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু সাদা আলো তৈরী করার জন্য প্রয়োজন লাল ও সবুজের সাথে নীল আলো। অর্ধপরিবাহী থেকে নীল আলো তৈরী করার চেষ্টা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রায় তিরিশ বছর ধরে চলেছে। কিন্তু একমাত্র এই জাপানী বিজ্ঞানী তিনজন—**ইসামু আকাসাকী, হিরোশি আমানো** এবং **সুজি নাকামুরা** — প্রায় বিশ বছরের চেষ্টায় গ্যালিয়াম নাইট্রাইড এর বিভিন্ন স্তর এমন সঠিকভাবে প্রস্তুত করলেন যাতে নীল আলো যথাযথ উৎপন্ন হয়। তারপর ঐ নীল আলোকে এক ধরণের আলোকপ্রভ (phosphor) বস্তুর উপর আপতিত করে সাদা আলো উৎপন্ন হল। এইভাবেই তৈরী হল সাদা লেড বাতি যা আনলো আলোর জগতে যুগান্তকারী বিপ্লব। নোবেল পুরস্কার তাদের এই অসামান্য কৃতিত্বের প্রতি সম্মান জানানোর এক মহৎ প্রচেষ্টা মাত্র।

'আচ্ছে' দিনের আশায় আশাবাদী!

স্বপন চক্রবর্তী

'বিদেশে রাখা কালো টাকার প্রতিটি পয়সা ফিরিয়ে আনব। এটা আমার প্রতিশ্রুতি রাখার বিষয়।' সেই সকালে আকাশবাণীতে দ্বিতীয় বেতার ভাষণ 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। কত কালো টাকা বিদেশে রাখা আছে সে প্রসঙ্গে তথ্যের অস্বচ্ছতার দিকে নির্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনি, আমি, আমার সরকার বা আগের সরকার, কেউই জানে না, ঠিক কত কালো টাকা বিদেশে রাখা রয়েছে। তাই এখনই আমি টাকার পরিমাণ নিয়ে কথা বলতে চাই না। তবে যত টাকাই থাকুক সব ফেরানো হবে। আমার পক্ষে যা করার তার সবটাই করবো। প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণে জনগণ আশ্বস্ত হয়েছেন কি না বলা যাচ্ছে না, তবে আমি, আশায় আশাবাদী!'

শোনা যাচ্ছে বিদেশে নাকি ৫৫ লক্ষ কোটি কালো টাকা রাখা রয়েছে। সব ফিরিয়ে আনা হবে! প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক কালের ঘোষণা, যদি কোনওভাবে দেশের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া সেই বিপুল কালো টাকা দেশে ফেরত আনা যায়, তাহলে ভারতের প্রতিটি নাগরিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ১৫ লক্ষ টাকা করে ভারত সরকার দিয়ে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে দেশের বেশিরভাগ নিদারুণ কষ্টে থাকা মানুষের দৈন্যদশা ঘোচার আশায় আশাবাদী আমি, অবশ্যই! বেশির ভাগ মানুষের চূড়ান্ত আর্থিক সঙ্কট যে এতে খানিকটা প্রশমিত হবেই তা বলারই অপেক্ষা রাখে না।

বিদেশে কালো টাকা রাখা ৬২৭ জন ভারতীয়র 'এইচ এস বি সি' নামের তালিকা সর্বোচ্চ আদালতে জমা দিয়েছে সরকার। আমার কাছে প্রশ্ন উঠছে, যাঁদের কালো টাকা বিদেশে রাখা রয়েছে এখনও তাঁদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে না কেন? সরকারের দাবি, এখনই নামের তালিকা প্রকাশ করলে তদন্তে খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। যেদেশে সেই বিপুল কালো টাকা রাখা রয়েছে সে দেশের সরকার বিষয়টা স্বীকার না করলে আখেরে ক্ষতিই হবে। শোনা যায়, প্রধানমন্ত্রীর গতবারের রেডিও ভাষণের পর খাদির বিক্রি বেড়েছিল ১২৫ শতাংশ। মানে 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানে সচেতনতা বাড়ছে বলে অনেকে মনে করছেন!

এরপর তাহলে বাকি থাকে খাদ্যের সমস্যা। তথ্যনিষ্ঠ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, সরকার থেকে যদি দেশের প্রতিটি পরিবার পিছু মাসে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য দেওয়া হয়, তাহলে তার পরিমাণ হয় ৯০লক্ষ টনের আশপাশে। তার জন্য খাদ্য-ভর্তুকির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৭০,০০০ কোটি টাকা। টাকাটা একটু বেশি মনে হলেও এটা ভারতের সামগ্রিক আয়ের মাত্র ১.৫ শতাংশ। জানিয়ে রাখা ভাল, ২০০৮ সালেই তো কর্পোরেটদের কর ও অন্যান্য সুবিধা বাবদ ছাড় দেওয়া হয়েছিল প্রায় ৩,০০,০০০ কোটি টাকা। এই সমাজে কেউ না খেয়ে থাকবে না, এটা ভাবলে ৭০,০০০ কোটি টাকাটা খুব বেশি কি? এমতাবস্থায় আমি, ভারতের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে 'আচ্ছে' দিনের আশায় আশাবাদী রইলাম।

আলো ফেললেন শিশুশ্রমের অন্ধকার ভুবনে

নীতিশ মুখার্জি

নোবেল জয়ী কৈলাস সত্যার্থী।

কৈলাস সত্যার্থীকে প্রথম দেখার কথাটা আজও ভুলতে পারেননি পুলিস প্রধান অমিতাভ ঠাকুর। পরিষ্কার মনে আছে তাঁর, মাটিতে পড়ে আছেন কৈলাস। মাথা থেকে ঝরছে রক্ত! তাঁকে ঘিরে ধরে লাঠি, রড দিয়ে নির্মমভাবে মারছে বেশ কিছু লোক। সকলেই গ্রেট রোমান সার্কাসের কর্মী। সার্কাসে নাচ করার জন্য নেপাল থেকে বেশ কিছু কিশোরীকে পাচার করে নিয়ে আসা হয়েছে শুনে তাদের উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন কৈলাস। পুলিস অফিসার অমিতাভ দৌড়ে গিয়ে যখন রক্ষা করলেন কৈলাসকে, তখনও জ্ঞান আছে তাঁর। নিজের কাজের জন্য সেই অবস্থাতেও গর্বিত তিনি। অমিতাভ বলছিলেন, 'খুব ভাল লেগেছিল সেদিন। নিজের জীবন বিপন্ন করে সকলে তো এমন কাজ করতে আসেন না।'

২০১৪-র নোবেল শান্তি পুরস্কার ভাগ করে নিল ভারত ও পাকিস্তান। ভারতের কৈলাস সত্যার্থী এবং পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাই। একজনের বয়স ৬০ অন্যজনের বয়স ১৭। নরওয়ের নোবেল কমিটির বিচারে দু'জনকে এক মঞ্চে দাঁর করিয়ে দিল তাঁদের অবদানের ক্ষেত্রটির সাযুজ্যের কারণে। এক কথায় বলতে গেলে এই ক্ষেত্রটি শিশুমুক্তির লড়াই। শিশু-কিশোরের অধিকার, শিক্ষার অধিকারের লড়াই। দুই প্রতিবেশী দেশে যখন সীমান্ত-উত্তেজনার আঁচ, তখনই এল এই শান্তি পুরস্কার ভাগাভাগির সংবাদ। পরিহাস!

উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের সোয়াট উপত্যকা অঞ্চলে তালিবান জুলুমের বিরুদ্ধে, মেয়েদের পড়াশুনার হক নিয়ে মালালা সরব ১২ বছর বয়স থেকেই। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমের নজরে আসে সে তখন থেকেই। চড়া মাশুলও দিতে হয় এর জন্য। ঠিক দু'বছর আগে, ২০১২-র ৯ অক্টোবর তারিখে। স্কুলবাসে তাঁর ওপর হামলা চালায় তালিবান বন্দুকবাজ। তিন-তিনটে গুলি। মালালাকে উড়িয়ে আনা হয় ব্রিটেনে। চিকৎসকদের পরম যত্নে মৃত্যুর কোল থেকে ফিরে আসে বালিকা মালালা। তাঁর খ্যাতিতে নতুন পালক, সব থেকে কম বয়সে নোবেল জয়। আবদুস সালামের পর মালালা দ্বিতীয় নোবেল-জয়ী পাকিস্তানি। মালালার মতো আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে ইতোমধ্যেই খ্যাত নন কৈলাস। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে ভারতেও বেশির ভাগ লোক তাঁকে চিনতেনই না। ভারতীয় নাগরিক হিসেবে কৈলাস সত্যার্থী পঞ্চম নোবেল-জয়ী। পূর্বসূরীরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি ভি রমন, মাদার টেরিজা, অমর্ত্য সেন। নোবেল শান্তি পুরস্কারের দ্বিতীয় ভারতীয় প্রাপক। প্রথম মাদার টেরিজা। ২০০৭ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিল আন্তর্জাতিক আবহাওয়া পরিবর্তন প্যানেল, যার মাথায় ছিলেন এক ভারতীয়-রাজেন্দ্র পাচৌরি।

ভোপালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের লেকচারারের চাকরি ছেড়ে কৈলাস 'বচপন বাঁচাও আন্দোলন' শুরু করেছিলেন ১৯৮০ সালে। তারপর প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে 'আধুনিক' ভারতকে শিশুশ্রম এবং শিশুদাস প্রথার হাত থেকে মুক্ত করতে হানা চালিয়ে গেছেন একের পর এক খনি-গহ্বর, কারখানা, ইটভাটা, কার্পেট তৈরির দোকান, এমনকি যৌনপল্লীতেও। কখনও শ্রমিক, কখনও ব্যবসায়ী বা কখনও খরিদ্দার সেজে। শিশুশ্রম ছাড়াও যে কার্পেট তৈরি করা যায় ১৯৯৪ সালে সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন 'রাগমার্ক' (এখন নাম গুডউইজ ইন্টারন্যাশানাল) শুরু করে। কাজটা সোজা হয়নি। মাথা তো ফেটেছেই। মারের চোটে ভেঙেছে পিঠ, কাঁধের হাড়ও। একজন মারা গেছেন গুলিতে, একজন পিটুনিতে। এখনকার সহকর্মীদের প্রায় সকলেই বেশ কয়েকবার করে মার খেয়েছেন। শিশু-চাকরের বিরুদ্ধে কথা বলায় মধ্যবিত্তের তীব্র আক্রোশের মুখে পড়েছেন। তবুও ছাড়েননি শিশু উদ্ধারের মহানব্রত। কৈলাস দীর্ঘকাল ধরেই লড়ে আসছেন শিশুশ্রম বিলোপের লক্ষ্যে, শোষণের নিগড় থেকে উদ্ধার করে শৈশবকে তার স্বাভাবিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে। তিনি এবং তাঁর এন. জি. ও নানা কল-কারখানা, খনির দুঃসহ জীবন থেকে ৮০ হাজারের মতো শিশুকে উদ্ধার করেছেন, আলো ফেলেছেন শিশুশ্রমের অন্ধকার ভুবনে বলে নোবেল কমিটি উল্লেখ করেছে। কোথা থেকে পেলেন এমন কাজ করার উদ্দীপনা? উত্তরে কৈলাস ছোটবেলার একটা ঘটনার কথা বলে থাকেন। "জীবনে প্রথমবার বাবার হাত ধরে খুব গর্ব করে স্কুলে ঢুকছিলাম। চোখে পড়ল স্কুলের গেট ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় তারই বয়সের এক শিশু। পাশে দাঁড়িয়ে শিশুটির বাবা, পেশায় মুচি। ও স্কুলে যাবে না ? প্রশ্ন করেছিলাম সেই মুচিকে। উত্তর পেয়েছিলাম, 'কী করে যাবে? আমাদের ছেলেদের তো কাজ করা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই।' খুব খারাপ লেগেছিল কথাটা শুনে, জানান কৈলাস। সেই থেকেই ভেবে নিয়েছিলেন বড় হয়ে এই শিশুদের জন্য কিছু করবেন। এখন দক্ষিণ দিল্লীতে থাকলেও জন্মেছিলেন স্বাধীনতার সাড়ে ছয় বছর পরে মধ্যপ্রদেশের বিদিশা জেলায়, ১৯৫৪ সালের ১১ জানুয়ারি। ব্রাহ্মণ পরিবারে। বাবা ছিলেন পুলিস অফিসার। পড়াশুনা করেছিলেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে। উচ্চশিক্ষা নেন হাই ভোল্টেজ ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে। লেকচারার হিসাবে কিছুদিন কাজ করেন ভোপালে। ছাত্রাবস্থা থেকেই গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত। একবার এলাকার উচ্চ বংশের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন বাড়িতে। রান্নার দায়িত্ব দিয়েছিলেন স্থানীয় অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মানুষদের। জানতে পেরে সেই 'উচ্চ বংশের' বন্ধুরা শুধু নিমন্ত্রণে আসেননি তাই নয়, তাঁদের গোটা পরিবারটাকেই সামাজিকভাবে বয়কট করার ব্যবস্থা করেছিল সমাজের স্থানীয় মাথারা। দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। তারপর থেকেই নিজের ব্রাহ্মণ পরিচয় বাদ দিয়ে পদবি নিয়েছিলেন 'সত্যার্থী' — সত্যের অন্বেষী। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময়েই ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা জারি করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। আকৃষ্ট হয়েছিলেন বামপন্থাতেও। সত্যের পথে চলতে গিয়ে বাধা যেমন পেয়েছেন, পাশাপাশি এসেছে স্বীকৃতিও। এর আগে সত্যার্থীর কাজকর্মকে আন্তর্জাতিক মানে ভূষিত করেছে প্রথম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। এবার নোবেল। মালালার সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন মহা সচিব বান-কি-মুন সহ রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্য কর্তারা। আমেরিকা এবং ইউরোপের নেতারা। এই শুভকামনাকে ভরসা করেই বাধা ঠেলে এগিয়ে যেতে চান কৈলাস। পুরস্কার পাওয়ার পর নিজেই বলেছেন, 'কোটি কোটি শিশুর স্বর কোথাও পৌঁছল। ভারতের যেমন শয়ে শয়ে সমস্যা আছে, তেমনি আছে লাখো লাখো সমাধানও।' কৈলাস সত্যার্থীর স্ত্রী সুমেধা, এক ছেলে ভুবন রিভু, মেয়ে অসমিতা এবং জামাইকে নিয়ে সংসার। স্ত্রী কখনও কখনও ভালবেসে ডাকেন 'সবজি' বলে, উত্তরে কৈলাস 'দেবীজি' সম্বোধনে। সুযোগ পেলেই নিজ হাতে রান্নার তীব্র আগ্রহ। আসলে রান্নাও যে 'শিল্পই'! খাওয়াতেও ভীষণ ভালবাসেন কৈলাস সত্যের অন্বেষী।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ

দেবী মণ্ডল

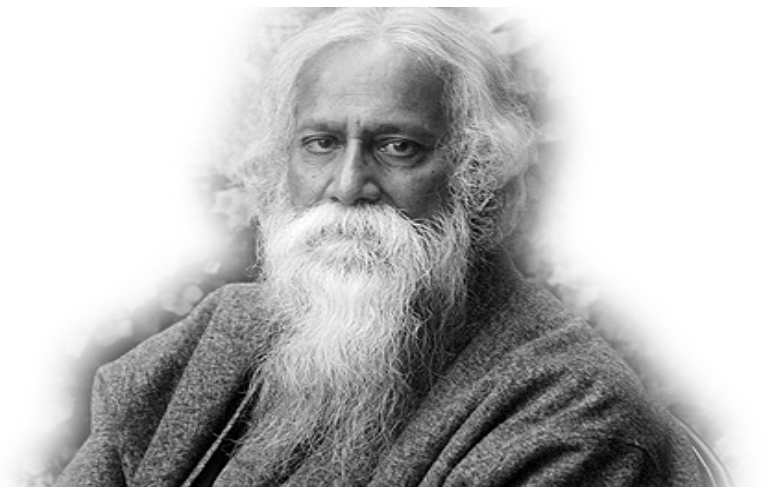

রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' উপাধিটি দিয়েছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'বোর্ডিং বিদ্যালয়' ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রূপ গ্রহণ করল। শিষ্যরা যেন বিদ্যার্জনের জন্য গুরুগৃহে বাস করছে—আর গুরুদেব হলেন রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীর কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে।"(রবীন্দ্রজীবনী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

আমরাও রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময় গুরুদেব বলে উল্লেখ করে থাকি। বস্তুতঃ গুরুদেব উপাধিটি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হয়েছে বলেই আমার মনে হয়।

'গুরু' বলতে বোঝায় ধর্মোপদেষ্টা, দীক্ষাদাতা, আচার্য, শিক্ষক। প্রকৃত অর্থে গুরু হলেন আলোকদিশারী। অজ্ঞানতা রূপ অন্ধকার নাশ করেন যিনি। 'গুরুস্তোত্রম্' এ গুরুবন্দনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে

'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্যজ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।'

রবীন্দ্রনাথের সৃজনকর্মের আলোকধারায় অবগাহন করে আমরা যেন বারবার এক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি। তিনি যেন এক পথপ্রদর্শক রূপে আমাদের মনকে চালনা করেন।

ঈশ্বর কি, তাঁকে কিভাবে লাভ করা যায় এ নিয়ে ভাবনার অবধি নেই। পূজা-অর্চনা, যাগ-যজ্ঞ, নাকি নিভৃত উপাসনা—কোনটি তাঁকে পাবার সঠিক পথ? শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ কথায় এর উত্তরটি হল—'যত মত, তত পথ।' রবীন্দ্রনাথের 'গীতিমাল্যে'র এই গানটিও যেন আমাদের চোখ খুলে দেয়।

"তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি
বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি"

ফুলের মালা, দীপের আলো নিয়ে ধূপের ধোঁওয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে স্তবের বাণী আওড়াতে গিয়ে লক্ষ্য ছাড়িয়ে উপলক্ষ্যকেই বড় করে তুলি। উপকরণের প্রাচুর্যে নয়, গভীর অন্তরবোধ দিয়েই যে ঈশ্বরকে অনুভব করা যায় এই সহজ সত্যটি নিমেষে উপলব্ধি করি গানটির মধ্যে দিয়ে। গীতাঞ্জলির ১১৯ সংখ্যক কবিতায় কবি বলছেন—

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।

কর্মের মধ্যে দিয়েই যে ধর্মপালন হয়—কর্মই যে ধর্ম কবিতাটির এই ভাব আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ধর্মের স্বরূপ, ঈশ্বরের স্বরূপ নতুন ভাবে ধরা দেয়।

আবার গীতাঞ্জলির ১০৭ সংখ্যক কবিতায় পড়ে আরেক ভাবনায় বিকশিত হয় মন। রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে যে ঈশ্বর বিরাজমান আমাদেরই চোখের সামনে তাঁকে পেতে গেলে অহংকারকে বিসর্জন দিতে হবে সবার আগে।

১০৮ সংখ্যক কবিতায় মানবপ্রেমশূন্য ঈশ্বর আরাধনায় যে কী ভয়ংকর বিপর্যয় ঘনিয়ে আসতে পারে সেদিকে কবি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন —

'সবারে না যদি ডাক
এখনো সরিয়া থাক
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান
মৃত্যুমাঝে হতে হবে চিতাভস্মে সবার সমান।'

শিক্ষাদাতা গুরুর ভূমিকা নিয়ে আমাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগে, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 'অচলায়তন' নাটকটির। এই নাটকের গ্রন্থপরিচয়ে গুরুর প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—

"যিনি গুরু তিনি সমস্ত আশ্রয় ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়া একটি শূন্যতা বিস্তার করিবার জন্য আসিতেছেন না। তিনি স্বভাবকে জাগাইবেন, অভাবকে ঘুচাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন—যেখানে অভ্যাসমাত্র আছে, সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন এবং যেখানে তপ্তবালু বিছানো খাদ আছে, মাত্র সেখানে প্রাণপরিপূর্ণ রসের ধারা বহাইবেন।"

'অচলায়তন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' নামক একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করেছেন। যার চারিদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দরজা-জানালা বন্ধ। মন্ত্র-তন্ত্র, প্রথার চাপে এখানকার বাসিন্দাদের স্বাধীন প্রকাশ ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেছে। আয়তনের এক বালক সুভদ্র নিছক কৌতূহলবশে উত্তরদিকের জানালা খুলে বাইরে তাকায়। তার এই কাজ অপরাধ বলে গণ্য হয় এবং মহাতামস ব্রতের দ্বারা তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করাবার সিদ্ধান্ত হয়।

যে ব্রত পালনের জন্য ছয়মাস ধরে সুভদ্রকে অন্ধকার ঘরে থাকতে হবে, আলোকের এক রশ্মিমাত্র সে দেখতে পাবে না। অচলায়তনের আরেক বালক পঞ্চক আয়তনের অর্থহীন নিয়মরীতি সম্পর্কে সন্দিহান—সে এসে দাঁড়ায় সুভদ্রের পাশে। পঞ্চক অপেক্ষা করে গুরুর আবির্ভাবের —যিনি তার সব সংশয়ের অবসান ঘটাবেন। বহু ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের পর রণবেশে গুরু আসেন আচলায়তনের প্রাচীর চূর্ণ করে দিয়ে। আয়তনের বালকেরা আনন্দে নৃত্য করে ওঠে, তারা দেখে, চারিদিক থেকেই আলো আসছে। যে আলো তারা এর আগে কোনোদিন দেখেনি। প্রাণহীন মন্ত্রতন্ত্র, আচার বিচার আঁকড়ে থাকা নীরস পরিচালক মণ্ডলীকে মনে করিয়ে দেন ধর্মকে প্রকাশ করবার জন্য, গতি দেবার জন্য আচারের সৃষ্টি। মন্ত্রের উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। মননবোধশূন্য হয়ে বিশেষ বিশেষ কোনো আচারকে আঁকতে থাকা মৃত্যুরই নামান্তর। এহেন অন্ধকারেই মহাতামস ব্রতের অস্তিত্ব বজায় থাকে—যা অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যায় না, আলো থেকে ঠেলে দেয় অন্ধকার গুহায়।

এভাবেই আলোক দিশারী গুরুকে প্রতিষ্ঠা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অচলায়তনের প্রাচীর চূর্ণ করে যিনি ক্ষান্ত হননি, নতুন ধ্যানধারণা, নতুন চিন্তাভাবনায় আবার তাকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজে হাত লাগিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনে মৃত্যু বারবার আঘাত হেনেছে। প্রিয়জনের বিয়োগ বেদনায় যন্ত্রণাকাতর হয়েছেন, কিন্তু তার সৃজন কর্ম থেকে তিনি বিরত হননি। বরং মৃত্যুর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে স্পর্ধাভরে তাকে বলতে পেরেছেন—

"তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো
এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।
(মৃত্যুঞ্জয় :পরিশেষ কাব্যগ্রন্থ)

তিনি উপলব্ধি করেছেন,

'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।'

প্রাণের যে নিত্যধারা বহমান তার যে ক্ষয় নেই, শেষ নেই, তাতে যে দৈন্যের লেশমাত্র নেই—এই বিশ্বাস জাগ্রত করে দেন মনে। শোক, দুঃখ, গ্লানির ম্লানতা কাটিয়ে ওঠার শক্তি সঞ্চার করেন, এই কথা মনে করিয়ে দিয়ে—

"দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন
পার আছে রে এই সাগরের বিপুল ক্রন্দন
এই জীবনের ব্যথা যত এইখানে সব হবে গত
চিরপ্রাণের আলোমাঝে অনন্ত সান্ত্বনা।"
(গীতবিতান : পূজা পর্যায়)

এভাবেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর গভীর বাণীর অমৃতস্পর্শে মন সঞ্জীবিত হয়—রসসিক্ত হয়। জগতের আনন্দযজ্ঞে সামিল হয়ে ওঠার সামর্থ্য লাভ করে। এই সঞ্জীবনী সুধা-বাণীর মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ যথার্থই হয়ে ওঠেন 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ'। আমরা প্রণত হই।

PURBA CALCUTTA NAGARIK PARISAD TRUST
862, Lake Town, Block-A, Kol - 700 089
Ph. No. : 2521-9184
is running
Eye Care Clinic
in collaboration with
GANDHI SEVA SANGHA
207/1, S. K. Dev Road, Kol - 700 048

ধনুষ্টংকার

ডাঃ শান্তনু মিত্র

জীবন মানে বেঁচে থাকার যুদ্ধ। আমরা অনেক যুদ্ধ করি। রোজগার, সম্মান, খাওয়া-পরা সব কিছুর পিছনে যুদ্ধ আছে। আবার আমাদের অগোচরে আমাদের শরীর সংগ্রাম করে চলে বহুরকম রোগবাহী জীবাণুর বিরুদ্ধে। তবেই আমরা বেঁচে থাকি। একটি বিশিষ্ট জীবাণুর সম্বন্ধে আজ অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব। টিটেনাস। বাংলায় ধনুষ্টংকার। আমাদের হাত পা কেটে ছড়ে যেতেই পারে। কপাল খারাপ হলে সামান্য ক্ষত থেকে ধনুষ্টংকার হতে পারে। হলে মৃত্যু মোটামুটি নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে।

শরীরে প্রধানত দু'রকম Skeletal Muscle থাকে। Extensors এবং Flexsors। আমরা হাঁ করি Flexsor muscle দিয়ে। মুখ বন্ধ করি Extensor muscle দিয়ে। ধনুষ্টংকার জীবাণু এক ধরনের Toxin (Exotoxin) শরীরে ছড়িয়ে দেবে যেটা Extensor muscle গুলিকে উত্তেজিত করতে থাকে এবং তারা প্রবলভাবে সঙ্কুচিত হয়। প্রথম লক্ষণ শুরু হয় মুখমণ্ডলের পেশীগুলিতে। ভ্রু অকারণে কুঁচকে থাকে এবং রোগীর প্রথম বক্তব্যঃ 'আমি হাঁ করতে পারছি না'। ক্রমশ সর্ব শরীরে অত্যন্ত বেদনাদায়ক Cramp শুরু হয়। পিঠের Extensor muscle Cramp-এর জন্য শরীর ধনুকের মত পিছনের দিকে বেঁকে যায়। তাই নাম ধনুষ্টংকার। অবশেষে Respiratory muscle Cramp-এর জন্য অক্সিজেনের অভাবে রোগীর মৃত্যু হয়। তাহলে এই ভয়াবহ রোগ থেকে বাঁচার উপায় কি? উপায় Immunisation, অর্থাৎ শরীরে প্রতিষেধকের (Antibody) উপস্থিতিতে। এই ইম্যুনাইজেশন দু'রকমভাবে হয়।

Active Immunisation : এখানে শরীরকে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে শেখানো হয়। কিছু টিটেনাস জীবাণুর exotoxin তৈরি করার ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়ে শরীরে প্রবেশ করানো হয়। ফলে রোগটা হয় না, কিন্তু শরীরে antibody তৈরি হতে শুরু করে। এটাই TET/VAC Injection। এরপর দুটি Booster Dose দিতে হয়। এই একই TET/VAC দিতে হয় প্রথম dose-এর এক থেকে দু'মাসের মধ্যে (1st booster) এবং প্রথম dose-এর সাত থেকে আট মাসের মধ্যে (2nd booster)। মাঝে কেটে-ছড়ে গেলেও আর প্রয়োজন নেই। তিনটে TET/VAC দেওয়া হলে, প্রথম dose-এর পরবর্তী পাঁচ বছর নিশ্চিন্ত। ষষ্ঠ বছরে 3rd Booster দিতে হবে। অতঃপর দশ বছর অন্তর একটি করে।

Passive Immunisation : এখানে readymade antibody শরীরে দেওয়া হয়। এই Injection এর নাম Tetglobe-250 international unit। এটা মোটামুটি তিন সপ্তাহ কাজ করে।

TET/VAC injection দেওয়া হলেও শরীরে antibody তৈরী হতে শুরু করবে তিন সপ্তাহ পর থেকে। তার আগে নয়। কিন্তু ধনুষ্টংকার হওয়া কপালে থাকলে ক্ষত হওয়ার দু'সপ্তাহের মধ্যেই হবে। সুতরাং যার আগে থেকে immunisation course complete করা নেই বা স্মরণ নেই, তার ক্ষত হলে TET/VAC শুরু করতে হবে এবং TET/VAC এর সাথে সাথে ওই Tetglobe injection প্রথম তিন সপ্তাহের cover হিসাবে দিয়ে দেওয়া উচিত। যদি TET/VAC-এর প্রথম dose ক্ষত হবার তিন সপ্তাহ আগেই নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে Tetglobe-এর প্রয়োজন নেই। শিশুদের ক্ষেত্রে Immunisation করা হয় আরো অন্য রোগের সঙ্গে। সেখানে dose অন্য রকম। সে আলোচনা এখানে করছি না। কারণ শিশুদের সম্বন্ধে সচেতনতা আছে। গ্রামাঞ্চলেও ব্যবস্থা এক। বাবা-মায়ের ভালই সচেতনতা দেখা যায়। কিন্তু সেই ব্যবস্থা কাজ করে সাত বছর অবধি। সাত বছরের পরে সবাইকে নিয়ম মাফিক TET/VAC দেওয়া উচিত। অবহেলা শুরু হয় এখান থেকে। শহরে গ্রামে এই অবহেলা সর্বত্র সমান। হয়তো ডাক্তারবাবুরাও ঠিকভাবে সবাইকে সচেতন করেন না। ক্ষত হলে যদি Tetanus immunisation ঠিকভাবে করা আছে কিনা সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে, তাহলে TET/VAC course শুরু করে দেওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে TET/VAC injection অল্প সময়ের মধ্যে যদি ভুল করে দু'বার পড়ে তাতে কোনও ক্ষতি নেই কিন্তু Tetanus হলে পরিণতি ভয়াবহ।

উপসংহার : সময় মত TET/VAC নিন, যাতে Tetglobe-এর প্রয়োজন না হয়। কারণ, TET/VAC-এর দাম দশ টাকা। কিন্তু Tetglobe আটশ টাকা। ওষুধের দোকানে গিয়েই এই ইঞ্জেকশন নিয়ে নেওয়াই ভাল। কারণ fridge-এর থেকে বাইরে থাকলে এগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১) গান্ধী সেবা সঙ্ঘের শিশু বিকাশ কেন্দ্রে হংকং সমদেশীয় ফাউণ্ডেশন দু'বারে চার হাজার করে অনুদান দিয়েছেন।

২) গ্রন্থাগারের জন্য এ বছর দক্ষিণ দমদম পৌরসভা ১৬ হাজার টাকা এবং উত্তর ২৪-পরগণা ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী অথরিটি ১২ হাজার টাকা বই কেনার জন্য অনুদান দিয়েছেন। এছাড়া ডঃ অসীম চ্যাটার্জী ৫ হাজার টাকা দিয়েছেন উত্তর পূর্ব ভারত সংক্রান্ত বই কেনার জন্য। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী মিহির সেনগুপ্ত মহাশয় এবং শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতি দীপিকা দত্ত গ্রন্থাগারে যথাক্রমে প্রায় ২০০টি এবং ২২০টি বই দান করেছেন। এছাড়া শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতি দে আরও প্রায় শতাধিক বই দিয়েছেন। শ্রীমতি রেখা রায়চৌধুরী প্রয়াত স্বামী প্রখ্যাত সাহিত্যিক অমিয় রায়চৌধুরীর স্মরণে একটি বইয়ের আলমারী ও তার রচনা সমগ্র গ্রন্থাগারকে উপহার দিয়েছেন। আমাদের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য শ্রী শম্ভুনাথ বণিক গ্রন্থাগারকে একটি নতুন কম্পিউটার উপহার দিয়েছেন বই সংরক্ষণের পদ্ধতিকে আধুনিকীকরণের জন্য। এছাড়া শ্রীমতি মৌসুমী দত্ত গ্রন্থাগারকে একটি কম্পিউটার দিয়েছেন এবং গ্রন্থাগারের উপযোগী সফট্ওয়্যার তৈরী করছেন। এছাড়া আমাদের সমিতির সদস্য শ্রী পঙ্কজ দত্ত, শ্রী প্রবীর গুহঠাকুরতা ও শ্রীমতি চন্দনা সাহা যথাক্রমে "সুস্থ" ও "সফর", "India Today", "ভ্রমণ", "তথ্যকেন্দ্র" ও "সুখী গৃহকোণ" মাসিক পত্রিকা নিয়মিত গ্রহণের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন।

৩) ক্যানসার রোগীদের পরিষেবার জন্য নোটারী পাবলিক শ্রী কমল পালের উদ্যোগে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের ল' ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের সৌজন্যে একটি ফ্রিজ ও একটি ওয়াশিং মেশিন পাওয়া গেছে। নাগের বাজারে শ্রীমতি সুব্রতা দাশগুপ্ত তাঁর প্রয়াত স্বামী শ্রী শুকদেব দাশগুপ্তের স্মরণে সেবা নিবাসকে এয়ার ম্যাট্রেস, নেবুলাইজার ও দু'টি গ্লুকোমিটার দান করেছেন।

আবেদন

গান্ধী সেবা সংঘের 'সেবা নিবাস'এ আসা ক্যানসার রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। সংঘ পরিচালন সমিতি তিন তলায় আরও ৪টি ঘর ও স্নানঘর বানানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এক মাসের মধ্যে কাজ আরম্ভ হবে। এরজন্য ১২লক্ষ টাকা প্রয়োজন। দান সংগ্রহ চলছে। এ পর্যন্ত 'সেবা নিবাসের' সমস্ত নির্মাণ কাজ হয়েছে সেবা মনস্ক বহু মানুষের দানে। এবারেও আমরা আপনাদের দান ও সহযোগীতার প্রত্যাশী। গান্ধী সেবা সংঘের জন্য সমস্ত দান আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারায় করমুক্ত।

সেবক পত্রিকার কার্যকরী সমিতি

সম্পাদক : জবা গুহঠাকুরতা

সেবক লোগো : দেবব্রত ঘোষ

সম্পাদকমণ্ডলী : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, উৎপল ঘোষ, শঙ্কর লাল ঘোষাল

পৃথ্বীপতি চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় আঢ্য, নীতিশ মুখার্জি

উপদেষ্টামণ্ডলী : হিরন্ময় সাহা, গৌতম সাহা

গান্ধী সেবা সংঘের দৈনন্দিন পরিষেবা

যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রতিদিন সকাল ৫.৩০ থেকে ৭.৩০ পর্যন্ত।

অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্র

প্রতি সোম থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অভিজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। ১০টাকা দিয়ে কার্ড করতে হয়। রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। লেকটাউনের 'UNIMED DIAGN - OSTIC CENTRE' এর সঙ্গে বন্দোবস্ত করা আছে। গান্ধী সেবা থেকে কোনো রুগী গেলে পরীক্ষার ব্যাপারে তাকে কিছুটা (৩০-৪০)% ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়।

৩) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্রঃ

সোম, বুধ ও শুক্রবার বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলে। চিকিৎসা ও ওষুধ বাবদ ৫ টাকা দিতে হয়।

চক্ষু বিভাগ

প্রতি সোমবার সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত পূর্ব কলিকাতা নাগরিক পরিষদের সৌজন্যে চক্ষু পরীক্ষা হয়। ৫টাকা দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। চক্ষু পরীক্ষা, ওষুধ চশমা, প্রয়োজনে ছানি অপারেশনও হয় বিনা খরচে।

প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টে থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত শুধুমাত্র চক্ষু পরীক্ষা হয়। ৫টাকা দিয়ে কার্ড হয়।

৫) ই সি জি

প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার সন্ধ্যে ৬টা থেকে ৭.৩০ পর্যন্ত অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ন দ্বারা ও বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট সহ ই সি জি হয় মাত্র ৪০টাকার বিনিময়ে।

৬) মা ও শিশুকল্যান কেন্দ্র (সরকারী টীকাকরণ কেন্দ্র)

প্রতি বুধবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের দ্বারা শিশুদের টীকাকরণ হয়। গর্ভবতী মায়েদের শরীর-স্বাস্থ্য পরীক্ষা ওষুধ বিতরণ করা হয়। শিশুদের জন্ম থেকেই যে সব টীকা দেওয়া হয় এখানে তার ভালো ব্যবস্থা আছে।

৭) শিশুবিকাশ কেন্দ্র

প্রতি রবিবার ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত শিশুদের আঁকা ও হাতের কাজ শেখানো হয়। মাসিক ১০টাকা দিতে হয়।

৮) গ্রন্থাগার

প্রতিদিন বিকেল ৫.৩০মি. থেকে রাতে ৮.৩০মি. পর্যন্ত গ্রন্থাগার খোলা থাকে। গ্রন্থাগারে ৯০০০ বই আছে। Reading Section এ India Today, সানন্দা, বর্তমান, এবেলা প্রতিদিন, দেশ, ভ্রমণ এ ধরনের ১২-১৩টি জনপ্রিয় পত্রিকা রাখা হয়।

৯) সাংস্কৃতিক বিভাগ

নিয়মিত নাটক গান-বাজনা, সাহিত্য আলোচনার আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে যে সব মানুষরা যুক্ত তাঁরা অবশ্যই এখানে অনুষ্ঠান করতে পারেন।

১০)মাণিক্য মঞ্চ

গান্ধী সেবা সংঘের মাণিক্য মঞ্চটি অঞ্চলের সংস্কৃতি প্রসারের প্রয়োজনে স্বল্পমূল্যে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। প্রয়োজনে অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

১১) সেবা নিবাস

দূর প্রান্ত থেকে যেসব ক্যান্সার-আক্রান্ত রোগী আসেন কলকাতা শহরের চিকিৎসার জন্য, তাঁদের সুলভে থাকার ব্যবস্থা করা হয় এই সেবানিবাসে। এখানে রান্নাঘর আছে। বাসনপত্র, বিছানা, চাদর, গ্যাসের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়। রোগীরা নিজেরাই রান্না করেন। এবং একটি ঘরোয়া পরিবেশে থাকেন।

সেবানিবাসের পরিকাঠামো ব্যবহারের জন্য অনুদান–

দোতলায়ঃ

১) দুই শয্যার ঘর(সংলগ্ন বাথরুম)

১ থেকে ৭ দিন থাকার জন্য প্রতিদিন ১২০ টাকা হিসেবে ৭দিনের বেশি থাকার প্রয়োজনে প্রতিদিন ১০০টাকা হিসেবে(পুরো সময়ের জন্য)

২) দুই শয্যার ঘর (কমন বাথরুম)

সাধারণ রোগী ও সঙ্গীদের জন্য ৭০ টাকা প্রতিদিন। বি. পি. এল বা বিশেষ সুপারিশ সহ রোগীদের জন্য ছাড় আছে।

তিনতলায়:

দুই শয্যার ঘর (কমন বাথরুম)

১থেকে ৭দিন থাকার জন্য প্রতিদিন ১০০ টাকা হিসেবে।

৭দিনের বেশি থাকার প্রয়োজনে প্রতিদিন ৮০ টাকা হিসেবে(পুরো সময়ের জন্য)

থাকার জন্য আবেদনপত্র ও টাকা জমা দেওয়ার নিয়মাবলি–

আবেদনপত্র সম্পূর্ণভাবে পূরণ করুন

১) সঙ্গে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্রের প্রতিলিপি জমা দিন।

২) সঙ্গী ছাড়া কোনও রোগীকে থাকতে দেওয়া হয় না।

৩) সেবানিবাসে সংক্রামক রোগীদের থাকার ব্যবস্থা নেই।

৪) ফর্ম জমা দেওয়ার সঙ্গে এক সপ্তাহের টাকা জমা দেওয়া আবশ্যিক।

৫) প্রতি সপ্তাহের শুরুতে অগ্রিম টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

৬) যে কোনও টাকা দেওয়ার সময় অবশ্যই পাকা রসিদ সংগ্রহ করবেন।

ফর্ম সেবা-কর্মীর কাছে বা অফিসে পাওয়া যাবে।

যে কোনও ধরনের অসুবিধার কথা সেবানিবাসের সেবা-কর্মীদের জানান ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

প্রয়োজনে যোগাযোগ–

Address: Gandhi More, 207/1,S. K. Deb Road,Shreebhumi, Lake Town, Kolkata-700 048

Office Phone : 2521-4011

Mobile :

Goutam Saha : 9432000260
Apurba Kundu : 9735101092
Deepa Dutta : 9007833036
Samir Nandi : 9830414527
Aniruddha Ghosh : 9830175498

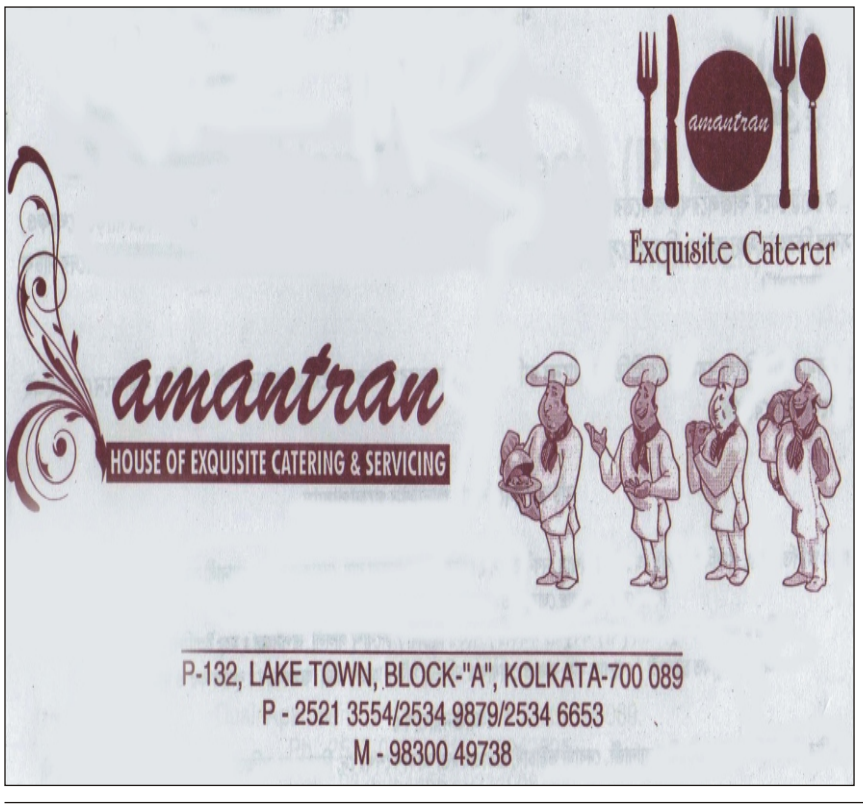

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে সুব্রত পাল কর্তৃক ২০৭/১ এস কে দেব রোড, কলকাতা - ৪৮ থেকে প্রকাশিত ও প্রিন্ট-ও-গ্রাফ, ৩ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলকাতা - ৯ হইতে মুদ্রিত
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। সম্পাদক : জবা গুহঠাকুরতা